

পাঠ্যপুস্তকে ধারাবাহিকতা থাকে যা ইচ্ছে তাই করা যায় না

আলমগীর খান

একেবারে শৈশব থেকে শিক্ষার বাহন হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তক শিশুদের মনন ও মানস গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ, মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করে থাকে। পাঠ্যপুস্তক কোন ছেলেখেলা নয়। এ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায় না। কিন্তু এবার স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ভুলভালোর যেসব কাহিনী ঘটল তা দেখে মনে হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক কর্মকর্তাদের খেলালখুশির কাজ। এমনভেই শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্যার শেষ নেই। প্রশপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় বাম্পার ফলনে সবাই যথেষ্ট চমকিত। এরপর আবার পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এসব কাণ্ডকারখানা দেখে দেশবাসী এত ঘন ঘন চমকিত হবার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আশ্চর্য হলো, সরকারের দিক থেকে এসব নিয়ে চমকপ্রদ কথা বলার কমতি নেই। প্রশ্নবোধক বিষয়গুলিকেও তারা সাফল্যের প্রতীক হিসেবে প্রচার করছেন। তারা এককথার মানুষ- শিক্ষা ব্যবস্থা রকেটের গতিতে এগিয়ে চলেছে।

‘অ’-তে ‘অজগর’ বললে নাকি একটি ভয়ঙ্কর প্রাণির কথা মনে হয়, তাই ‘অ’-তে নিত্যন্ত নিরীহ ‘অজ’। কিন্তু ‘অ’-তে ‘অজগর’ বাংলার শিশুরা যুগ যুগ ধরে শিখছে। কখনো কোন শিশু ভয়ে কেঁদে ফেলেছে, এমন কোনো ঘটনার কথা শোনা যায়নি। কোন প্রাণী ভয়ঙ্কর বা নৃশংস কি-না, সে বিচার কে করছে? কথা বলতে পারলে আফ্রিকার অজগর থেকে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার পর্যন্ত সবাই যে মানুষকে সবচেয়ে নৃশংস প্রাণী বলত, তাতে কারো সন্দেহ আছে? মানুষের তৈরি ছুরি ও বন্দুক অজগরের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর নয় কি? অজগর শিশুরা কোথায় দেখবে? ছুরি-বন্দুক তারা প্রায়ই দেখে থাকে, বইয়ে পড়ারও দরকার হয় না। ‘অ’-তে ‘অজগর’ পড়ে ভয়ে কঁকড়ে ওঠার বহু আগে এদেশে মাতৃগর্ভেই এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তার কি ভাগ্য- সে বইয়ে অজগরের ছবি দেখে আর ভয় পাবে না! সে পড়বে ‘অ’-তে ‘অজ’ যার নামও সে শোনে। হ্যাঁ সে গ্রামের শিশু হলে

মায়ের পেট থেকে পড়েই ছাগল দেখেছে। কিন্তু একে ‘অজ’ বলে সে কোনদিন শোনেনি। তবে আজ বইয়ে ছাগলের ছবি দেখে সে এক বিরাট জ্ঞানার্জন করলো বৈকি! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে এমন হলে তিনি লিখিতেন- ‘শিশুটির উচিৎ শিক্ষা হইয়াছে’। কিন্তু শিক্ষা তো সবে শুরু। এরপর শিক্ষা আর ধরে না! ছাগল আম খেতে গাছে চড়েছে। ‘শিক্ষার একেবারে হৃদমুদ’। শিশুর ‘কী কপাল!’ আহাহাহা! ভাগিনার কথা রবীন্দ্রনাথকে মানতেই হবে- শিশুটির ‘শিক্ষা পুরো হইয়াছে’। (তোতা-কাহিনী)

এবারকার পাঠ্যপুস্তক নিয়ে অনেক কথাই ফাঁস হয়েছে। ৪ কোটি টাকার ১৫ লাখ বই ছাপা হওয়ার পর বাদ দেয়া হয় ও নতুন করে ছাপানো হয়। দুটি লেখা বাদ দেয়ার স্বার্থে নাকি এ কাজ করা হয়। কিন্তু ৪ কোটি টাকা তো এদেশের গরিব মানুষের। এই টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা হয় কিভাবে? ৪ কোটি টাকা দিয়ে কতজন গরিব শিশুর একবেলা খাবার বা তাদের প্রাথমিক শিক্ষা হয়, সে কথা কি ভেবে দেখেছি? যে দুটি লেখা বাদ দেয়া হয়েছে, সেগুলো কি পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেছে? স্কুলের পাঠ্যবই থেকে বাদ দেয়ায় তো আর ওগুলো অপাঠ্য হয়ে যায়নি। পৃথিবীতে লেখাগুলো আছে ও থাকবে। পাঠ্যবই নিয়ে এসব ধস্তাধস্তি করে কার লাভ আর কার ক্ষতি হলো?

আমরা যে একটি বইবিমুখ জাতি সে পরিচয় আমাদের পদেপদে আছে। বই না কেনা নিয়ে এত চাবুক খাওয়ার পর চাবুকই ছিড়ে গেছে আর মনে হয় সৈয়দ মুজতবা আলীর হাত ব্যথা হয়ে গেছে, আমাদের পুরক চামড়ায় তা কোন দাগ ফেলেনি। বই কেনা ও পড়ার অভ্যাস আমাদের জাতিতে ভয়ঙ্কর রকমের কম। আর এ কারণে বই বলতে আমরা বেশিরভাগ মানুষ স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই ছাড়া কিছু বুঝি না। এর বাইরে সব যেন অপাঠ্য। অথচ স্কুল-কলেজের বই তো আমাদের সামনে শুধু বইয়ের জগতের দরজাটা খুলে দেয়। স্কুল-কলেজে যে জ্ঞানার্জন তা জ্ঞানসমুদ্রের কিনারা মাত্র। স্কুল

থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাড়া অন্য কিছু না পড়ে বেশি নম্বর পেয়ে কখনো পাস দিয়েই যারা নিজেদের শিক্ষিত সমাজের শিরোমণি মনে করেন, তারা অজ্ঞানতার স্বর্গে বাস করেন। তাদের বেলায় শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে, কেননা স্কুল-কলেজের শিক্ষা তাদের মাঝে একটা কুৎসিত অহমবোধ তৈরি করা ছাড়া আর কিছু করেনি। স্কুল-কলেজের বইয়ের বাইরে জগতে আর কোন বই নেই যারা মনে করেন ও সেই বিরাট জগৎ থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখতে চান, তারাই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে কুস্তি লড়েন। নিজের ইচ্ছেমতো দু-চারটে বিষয় ঠেলেঠেলে চুকিয়ে দিয়ে তারা দুর্ভিত্তি হাসিল করতে চান। এভাবেই পাঠ্যপুস্তকের ক্ষতিসাধন করা হয়।

আমাদের মতো একটা বই-বিমুখ জাতির জন্য পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই। এর মধ্য দিয়ে অন্তত একটা উন্নত সুসম গণতান্ত্রিক চিন্তাশীল জাতীয় চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব। বই পড়া ও না পড়ার ব্যাপারে সবাই স্বাধীন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বই না পড়ার স্বাধীনতা কোন শিক্ষার্থীর নেই। পড়তে বাধ্য। অন্তত সনদপত্রের জন্য। যে সনদপত্র দেখিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বেশ কিছু কাজক্ষত সুবিধা নেয়া যায়। কাদেরকে এসব সুবিধা দেয়া হবে সেই পরিকল্পনা থেকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় সাজানো হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনের চেয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজন বড়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুসংস্কার বহু মানুষের প্রিয়, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে কুসংস্কার নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়। ভুল ধারণা বেশি জনপ্রিয় ও প্রচলিত। পাঠ্যপুস্তকে সেসবের বিপরীত অর্থাৎ যা সঠিক সেই ধারণা দেয়া হয়। সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে- এ প্রমাণ দিয়ে যে কেউ হাজার হাজার বই লিখতে ও তা প্রচার করতে পারেন, একমাত্র পাঠকের অভাব ও ব্যবসায় মার খাওয়া ছাড়া তার সামনে কোন বাধা নেই। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে শেখানো হয়- পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। কেননা

পাঠ্যপুস্তক একজন ব্যক্তির লেখা নয়, বহু মানুষের মেধা এখানে যুক্ত থাকে যাদেরকে জনগণের ঘামার্জিত অর্থে সম্মানী দেয়া হয়। প্রশ্ন হতে পারে, পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন থাকবে না কেন। থাকবে বৈকি। তবে সে প্রতিফলন প্রকাশ্য ও দ্বীর্ঘ আলোচনা-সমালোচনার ফল হিসেবে, অন্য কোন প্রক্রিয়ায় নয়।

মনে রাখা দরকার, আজকের পাঠ্যপুস্তক গতকালের লেখা নয়। অথবা আজ একখান পাঠ্যপুস্তক লিখে তা আগামীকাল বের করা যায় না। কারণ এটি ভুইফোড় কোন জিনিস নয়। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের জন্য হঠাৎ সেদিনকার এক সকালে বা বিকেলে নয়। এর একটি ধারাবাহিকতা আছে। এর বয়স কম করে হলেও কয়েক শ’ বছর। অর্থাৎ এটি কয়েক শ’ বছর বয়সী একটি বৃক্ষ। প্রতি বছর যে বই বের হয় তা নতুন নতুন নয়, যদিও ছাপানো নতুন। বৃক্ষ যেমন প্রতিদিন বড় হয় ও প্রতিদিন তাতে পরিবর্তন হয়, পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন অনেকটা তেমন। হঠাৎ পাঠ্যপুস্তকে ইচ্ছে মতো বিরাট বিরাট পরিবর্তন আনা সুন্দরবন ধ্বংস করে আরও সুন্দর আরেকটি বন তৈরি করার মূর্খতার মতো।

স্কুলের শিক্ষা জীবনের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। সে কারণে এখানে কী শেখানো হবে ও কীভাবে শেখানো হবে তা যখন তখন ইচ্ছেমতো বদলানো উচিত নয়। একটা ধারাবাহিকতাকে মেনে নিয়ে এসব পরিবর্তন প্রয়োজন। সারা বছরই আমাদের রাস্তাঘাটের খোঁড়াখুঁড়ি চলে, তাতে পথচারী ও গাড়ির যাত্রীর যত উপকার হয়, তার চেয়ে বেশি উপকার হয় খোঁড়াখুঁড়িওয়ালাদের। কিন্তু রাস্তাঘাটের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা। এক্ষেত্রে এত খোঁড়াখুঁড়ি না করলেই শিশুদের মঙ্গল। যেভাবে বলা-কওয়া ছাড়াই ‘অ’-তে ‘অজ’ হয়ে ছাগল আম খেতে গাছে চড়ে শুক করেছে, তাতে শিশু শিক্ষার এ যাবৎকালের সব ধারণাই গাছে চড়েছে, শিশু মনকেও গাছে চড়ায়ে ছাড়বে।